অসংক্রামক রোগ

নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

অসংক্রামক রোগসমূহ

ডায়াবেটিস

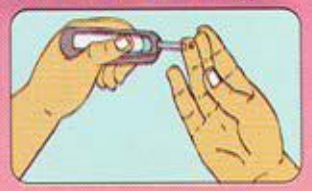

উচ্চ রক্তচাপ

হৃদরোগ

সিওপিডি
(ফুসফুসের সিওপিডি রোগ)

ক্যানসার

নীরব ঘাতক

- অসংক্রামক রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয় না, চিকিৎসা এবং নিয়মনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
- অসংক্রামক রোগ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তাই এসব রোগ প্রতিরোধ করাই উত্তম।

অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয়

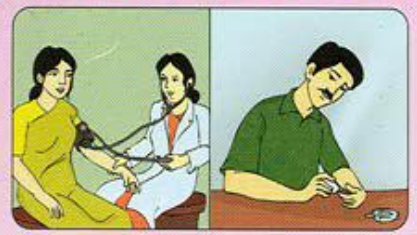

বয়স ৩৫ হলে প্রত্যেককে বছরে কমপক্ষে ১ বার ডায়াবেটিস ও রক্তচাপ পরীক্ষা করতে হবে

নিয়মিত কায়িক শ্রম করতে হবে

ধূমপান, তামাক সেবন এবং মদ্যপান পরিহার করতে হবে

অতিরিক্ত তেল, চর্বি এবং আলগা লবণ বাদ দিতে হবে

অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে হবে

কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস কি ?

আমরা যেসব খাদ্য গ্রহন করি তার শর্করা জাতীয় অংশ পরিপাকের পরে সিংহভাগ গ্লুকোজ হিসেবে রক্তে প্রবেশ করে। আর দেহকোষগুলি প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপাদনের জন্য গ্লুকোজ গ্রহণ করে। অধিকাংশ দেহকোষই এই গ্লুকোজ গ্রহণের জন্য ইনসুলিন নামক এক প্রকার হরমোনের উপর নির্ভরশীল। ডায়াবেটিস হলো ইনসুলিনের সমস্যা জনিত রোগ। ইনসুলিন কম বা অকার্যকর হওয়ার জন্য কোষে গ্লুকোজের ঘাটতি এবং রক্তে গ্লুকোজের বাড়তি হয়। এই সামগ্রিক অবস্থাই হচ্ছে ডায়াবেটিস মেলাইটাস।

কারো রক্তে গ্লুকোজ সুনির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করলেই তাকে ডায়াবেটিস রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই মাত্রাগুলি হলো অভূক্ত অবস্থায় রক্তের প্লাজমায় প্রতিলিটার ৭.০ মিলিমোল বা তার বেশি অথবা অভূক্ত ব্যক্তিকে (পূর্ণবয়স্ক) ৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ানোর ২ ঘন্টা পর প্রতিলিটারে ১১.১ মিলি মোল বা তার বেশি হলে।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ কি ?

সুনির্দিষ্ট লক্ষণ

ক) ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া
খ) ঘনঘন পিপাসা লাগা
গ) ঘনঘন ক্ষুধা পাওয়া
ঘ) যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া
ঙ) ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করা

সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নয়

চ) ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়া
ছ) চোখে কম দেখা
জ) খোশ-পাঁচড়া, ফোঁড়া প্রভৃতি চর্মরোগ দেখা দেওয়া
ঝ) বারে বারে প্রসব সমস্যা বা বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাওয়া

* অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য কারনে পরীক্ষায় ডায়াবেটিস ধরা পরে। শতকরা ৫০% বয়স্ক রোগীদের এসব লক্ষণ প্রকাশ পায় না তবে সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষাতেই ডায়াবেটিস ধরা পরে

কাদের ডায়াবেটিস হতে পারে ?

যে কেউ যে কোন বয়সে যে কোন সময় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন। তবে নিম্নে উল্লেখিত শ্রেণীর লোকের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ক) যাদের বংশে, যেমন-বাবা-মা বা রক্ত সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে
খ) যাদের ওজন অনেক বেশি বা পেট/ভুড়ি বেশি
গ) যারা ব্যায়াম বা শারিরীক পরিশ্রমের কাজ করেন না
ঘ) বহুদিন স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে
ঙ) বহুমূত্র পূর্ব শর্করা আধিক্য।

যেসব অবস্থায় ডায়াবেটিস প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে :

ক) শারিরীক স্থুলতা খ) গর্ভাবস্থা গ) ক্ষত ঘ) আঘাত ঙ) অস্ত্রপচার চ) মানসিক বিপর্যয় ছ) রক্তনালীর অসুস্থতার কারনে হঠাৎ করে মস্তিষ্কের রোগ জ) বহুদিন ধরে স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করলে।

ডায়াবেটিস কি সারানো যায় ?

ডায়াবেটিস রোগ সারে না। এ রোগ সারা জীবনের রোগ। তবে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ রোগকে খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রনে থাকলে প্রায় স্বাভাবিক কর্মক্ষম জীবন যাপন করা সম্ভব।

ডায়াবেটিস রোগীর নিয়মকানুন:

- চিকিৎসকের পরামর্শমতো ওষুধ সেবন করবেন/ইনসুলিন গ্রহণ করবেন।
- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট হাঁটবেন বা হালকা ব্যায়াম করবেন।
- চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার সম্পূর্ণ পরিহার করবেন।
- শর্করাজাতীয় খাবার পরিমিত এবং শাকসবজি বেশি খাবেন।
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন।

ডায়াবেটিক মহিলাদের জন্য জ্ঞাতব্য

ডায়াবেটিক মহিলা যদি সন্তান ধারণ করতে চান, তবে গর্ভবতী হওয়ার পূর্বে অবশ্যই তাকে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ৩-৫ মাস আগে থেকেই খাওয়ার বড়ি বাদ দিয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনসুলিন নিতে হবে। HbA1c ৬.৫% এর কাছাকাছি হলে চিকিৎসকের অনুমতি স্বাপেক্ষে গর্ভধারনে আসতে পারেন। গর্ভকালীন অবস্থায় তাকে ইনসুলিনের সাহায্যে তার রক্তের চিনির মাত্রা অভূক্ত অবস্থায় ৫.০ m.mol/L এবং খাবারের পরে ৭.০ m.mol/L এর নিচে রাখতে হবে। অন্যথায় শিশুর ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ থেকে শুরু করে বিভিন্ন শারিরীক সমস্যা হতে পারে।

ডায়াবেটিস রোগের জরুরী অবস্থা

হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করা স্বল্পতা):

রক্তে শর্করার পরিমান কমানোর জন্য ট্যাবলেট বা ইনসুলিন দেওয়া হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত ট্যাবলেট খাওয়ার বা ইনসুলিন নেওয়ার ফলে যদি শর্করার পরিমান খুব কমে যায় অর্থাৎ ২.৫ মিলি মোলের কম হয় তাহলে শরীরে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তবে অনেকের বেশি দ্রুত শর্করা নামিয়ে আনলে রক্তে বেশি শর্করা থাকলেও এই ধরনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

প্রতিক্রিয়ার লক্ষণগুলি নিম্নরুপ:

ক) অসুস্থ বোধ করা
খ) খুব বেশি খিদে পাওয়া
গ) বুক ধড়ফড় করা
ঘ) বেশি ঘাম হওয়া
ঙ) শরীর কাঁপতে থাকা
চ) শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা
ছ) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

কেন এবং কখন এইসব লক্ষণ দেখা যায় ?

ক) ঔষধের (ট্যাবলেট বা ইনসুলিন) পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলে।
খ) বরাদ্দের চেয়ে খাবার খুব কম হলে বা খেতে ভুলে গেলে
গ) ইনসুলিন নেওয়ার পর খুব দেরি করে খাবার খেলে
ঘ) হঠাৎ বেশি ব্যায়াম বা দৈহিক পরিশ্রম করলে
ঙ) বমি বা পাতলা পায়খানার জন্য শর্করা অন্ত্রনালী হতে শোষন না হলে

হাইপোগ্লাইসেমিয়া হলে কি করা উচিত ?

প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া মাত্রই রোগী চা চামচের ৪ থেকে ৮ চামচ গ্লুকোজ বা চিনি এক গ্লাস পানিতে গুলে খেয়ে নেবেন কিংবা তাকে খাইয়ে দিতে হবে। রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে মুখে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা না করে গ্লুকোজ ইনজেকশন দিতে হবে বা তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

- 0 -

কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

গ্যাসট্রিক আলসার

গ্যাসট্রিক আলসার কি?

মনবদেহের খাদ্য নালী মুখগহ্বর থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। উহার দৈর্ঘ প্রায় ৩০ ফিট। বিভিন্ন কারনে এ খাদ্য নালীর বিভিন্ন অংশে ঘা/আলসার হয়ে থাকে। খাদ্য নালীর পাকস্থলী অংশে যে ঘা বা আলসার হয় তাকে গ্যাসট্রিক আলসার বলে।

যেসব কারণে গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়:

১। বেশী ভাজি, পোড়া, ঝাল ও তৈলাক্ত খাবার খেলে
২। অনিয়মিত খাবার খেলে
৩। ধূমপান করলে
৪। বেশী দুঃচিন্তা করলে
৫। স্টেরয়েড ঔষধ সেবন করলে
৬। বাতের ব্যাথার ঔষধ সেবন করলে
৭। আয়রন বড়ি, ভিটামিন-সি খালি পেটে খেলে
৮। মাদকদ্রব্য, অ্যালকোহল খেলে গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়।

গ্যাস্ট্রিক আলসারের লক্ষণ:

১। চুকা ঢেকুর হবে
২। বুক জ্বালাপোড়া করবে
৩। খাবারের পরে ব্যাথা বেশি হবে
৪। বমি-বমি ভাব হবে
৫। খাওয়ার অরুচি হবে
৬। বমি করলে ব্যাথা বড়বে
৭। বাম দিকে চাপ দিলে ব্যাথা বেশি হবে
৮। পেট ভরা ভরা ভাব হবে।

জটিলতা:

১। রক্ত ক্ষরণ
২। পাকস্থলী ছিদ্র হওয়া
৩। পাকস্থলীর নীচের অংশ চিকন হওয়া

পরামর্শ:

১। ভাজি, পোড়া, ঝাল ও তৈলাক্ত খাবার কম খাওয়া
২। নিয়মিত খাবার খাওয়া
৩। ধূমপান না করা
৪। দুঃচিন্তা না করা
৫। স্টেরয়েড ঔষধ সেবন করলে
৬। মাদকদ্রব্য, অ্যালকোহল পরিহার করা।

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ কি?

মানবদেহে হার্ট (হৃৎপিন্ড) নামক একটি পাম্প মেশিন আছে। এটি স্বাভাবিক অবস্থায় (অপ্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে) প্রতি মিনিট ৬০ থেকে ৮০ বার হার্ট থেকে রক্ত পাম্প করে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পাঠায়। এই সময় হার্ট সঙ্কুচিত হয় এবং হার্ট থেকে বেশি প্রেসারে রক্ত ধমনী (রক্তনালী) দিয়ে বের হয়ে যায়। এই সময় যে রক্তচাপ থাকে তাকে Systolic blood pressure বলা হয়। এরপর হার্ট প্রসারিত হয়ে সারা শরীর থেকে ফিরে আসা রক্ত গ্রহণ করে। এই সময় রক্তনালীতে যে রক্তচাপ থাকে সেটাকে বলা হয় Diastolic blood pressure। কারো রক্তচাপ লিখতে/বলতে $\frac{\text{Systolic pressure}}{\text{Diastolic pressure}}$ লেখা/বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ $\frac{১২০}{৮০}$ বা $\frac{১১০}{৭০}$ মিলিমিটার পারদ।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের Systolic blood pressure ৯০ থেকে ১৩৯ এবং Diastolic blood pressure ৬০ থেকে ৮৯ মিলি পারদ হয়ে থাকে। অর্থাৎ রক্তচাপ $\frac{৯০}{৬০}$ থেকে $\frac{১৩৯}{৮৯}$ পর্যন্ত স্বাভাবিক ধরা হয়। অর্থাৎ রক্তচাপ যদি ১৪০/৯০ বা তার বেশি হয় তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপের রুগী বলে ধরে নেয়া হয়।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ:

- বংশগত
- অতিরিক্ত লবণ বা এ্যালকোহল খাওয়া
- উদ্বেগ বা টেনশন
- স্থূলতা
- গর্ভাবস্থা
- কিডনি রোগ
- বিভিন্ন হরমোন সংক্রান্ত রোগ
- জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি
- স্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ইত্যাদি।

উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ:

- মাথাব্যাথা (ভোরে ও মাথার পিছনের দিকে বেশি হয়ে থাকে)
- মাথা ঘুরানো
- অনিদ্রা
- বুক ধড়পড় করা
- ক্লান্তি
- নাক থেকে রক্তক্ষরণ
- ঘনঘন প্রসাব হওয়া ইত্যাদি।

উচ্চ রক্তচাপ রোগীর নিয়মকানুন:

নিবন্ধিত চিকিৎসকের কাছে রক্তচাপ পরীক্ষা করে উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া। উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তা নিয়ে আতঙ্কগ্রস্থ না হয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করাঃ

- খাবারে স্বাভাবিক লবণ খাওয়া এবং আলগা/টোকা লবণ খাওয়া থেকে বিরত থাকা।
- বেশী চর্বিযুক্ত খাবার যেমন- খাসি, গরু, ব্রয়লার মুরগীর মাংস, ঘি-মাখন, পনির, দুধের সর, চিংড়ি মাছ, ফাস্টফুড খাওয়া বর্জন করা।
- ধুমপান বর্জন করা।
- নিয়মিত ব্যায়াম যেমন দৈনিক ৩০ মিনিট হাঁটা।
- এ্যালকোহল বা মদ্যপান থেকে বিরত থাকা।
- নামাজ পড়া বা প্রার্থনা করা।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নির্দেশিত ঔষধ সেবন করা।
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

উল্লেখ্য যে উচ্চ রক্তচাপ একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ। চিকিৎসার মাধ্যমে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় কিন্তু এমন ঔষধ পাওয়া যায় না যার কোর্স খেলে বাকি জীবন আর খেতে হবে না। প্রয়োজন অনুযায়ী ঔষধ বাড়াতে বা কমাতে হয় যা আপনার চিকিৎসকের কাজ, এই কাজটি আপনার নয়। আপনি এবং আপনার পরিবারস্থ কেউ বা একাধিক ব্যক্তি রক্তচাপ কিভাবে মাপতে হয় তা শিখে নিবেন এবং প্রয়োজনমতো রক্তচাপ মাপাবেন। আজকাল ডিজিটাল ব্লাডপ্রেসার মেশিন পাওয়া যায় যেগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে রক্তচাপ মেপে দেয়। কিছুদিন ঔষধ সেবনের পর রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকলেই ঔষধ বন্ধ করবেন না। ঔষধ বিক্রেতার পরামর্শে ঔষধ বন্ধ করা বা ডোজ পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার মনের মত সবকিছু হবেনা। পৃথিবীতে একজন মানুষও নেই যার মনের মত সবকিছু হয়েছে। অতএব কোন কিছু পছন্দ না হলেই উত্তেজিত হবেন না। মনে রাখবেন ***'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। প্রতিকূলতাকে সহজভাবে গ্রহণ করার অভ্যাস তৈরী করুন। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন, সুস্থ থাকুন'***।

কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

হৃদরোগ

হৃদরোগ কি?

হৃদরোগ হলো হৃদপিন্ড ঘটিত রোগ। যেকোন রোগ হৃদপিন্ডকে আক্রমন করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে হৃদরোগ এখন মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বিশ্বে প্রায় ২৪% মৃত্যুর কারণ হৃদরোগ।

হৃদরোগের লক্ষণ:

- বুকে চাপ অনুভূত হওয়া।
- বুকে প্রচন্ড ব্যথা করা।
- বুক ধড়পড় করা।
- হাঁটলে বা পরিশ্রম করলে বুকে ব্যথা এবং বিশ্রামে ব্যথা কমে যাওয়া।
- শ্বাসকষ্ট হওয়া।
- গা ঘেমে যাওয়া।
- গা শীতল হয়ে যাওয়া।

হৃদরোগের কারণ:

১. ডায়াবেটিস
২. উচ্চ রক্তচাপ
৩. রক্তে চর্বি ও কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া
৪. ধূমপান
৫. অলস জীবন যাপন করা
৬. জেনেটিক (বংশের কারো হৃদরোগ থাকা)
৭. ওবেজ / ওজন বেড়ে যাওয়া
৮. ধূমপানকারীদের সাথে থেকে পরোক্ষ ধূমপান
৯. রক্তনালীতে প্রদাহ

হৃদরোগ প্রতিরোধে করণীয়:

- ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ জেনে নিতে হবে এবং প্রয়োজনে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।
- উচ্চতা অনুযায়ী ওজন ঠিক রাখতে হবে।
- চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে।
- ধূমপান ও তামাক সেবন পরিহার করতে হবে।
- শাকসবজি ও ফলমুল বেশি খেতে হবে।
- নিয়মিত কায়িক পরিশ্রম করতে হবে।
- শ্বাসকষ্ট, বুকে তীব্র ব্যাথা, মুখে ও পায়ে পানি আসলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

যেসব পরীক্ষার মাধ্যমে হৃদরোগ নির্ণয় করা যায়:

- ইসিজি
- রক্তের- লিপিড প্রোফাইল, ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা
- ইকোকার্ডিওগ্রাম
- ইটিটি
- এনজিওগ্রাম

হার্ট এটাক হলে কি করবেন?

(১) সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়বেন
(২) জিহ্বার নিচে গ্লিসারিন ট্রাইনাইট্রেড ট্যাবলেট বা স্প্রে ২চাপ দিবেন। না কমলে ৫মিনিট পরে আবার স্প্রে ২চাপ দিবেন
(৩) অক্সিজেন দিবেন
(৪) দ্রুত হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের চিকিৎসা নিবেন।

- 0 -

হাঁপানি /এজমা (Asthma)

এজমা কি?

এজমা বা হাঁপানি শ্বাসনালীর একটি জটিল দীর্ঘকালীন প্রদাহজনিত রোগ যা কোন বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়ার ফলে শ্বাসনালীতে বায়ুপ্রবাহে সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

এজমার লক্ষণ:

- শ্বাসকষ্ট (Breathlessness) হওয়া।
- শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার সময় বুকে বাঁশির মত শব্দ (Wheeze) হওয়া।
- কাশি (Cough) হওয়া।
- বুক চেপে আসা (Chest Tightness)।

এজমার কারণ:

এজমার সঠিক কারণ জানা যায় নাই। তবে ধারনা করা হয় এজমা বিভিন্ন কারণের সমষ্টি (Multifactorial)।

- **বংশগত/পারিবারিক কারণ:** পিতামাতার এজমা থাকলে বা এলার্জী রোগ থাকলে সন্তানদের তা হতে পারে।
- **পরিবেশগত কারণ:** ফুলের রেনু, ছত্রাক, ঘরের ধূলাবালি, পোকামাকড়, পশুপাখির মলমূত্র, পালক, চামড়া, তেলাপোকা ইত্যাদি।
- **খাদ্য সংক্রান্ত কারণ:** গরুর মাংস, চিংড়ী মাছ, ইলিশ মাছ ও অন্যান্য কিছু মাছ, হাসের ডিম, খাবারের রাসায়নিক দ্রব্যাদি, গরুর দুধ, কিছু সবজি, বাদাম, চকোলেট ইত্যাদি।
- **উত্তেজকগত কারণ (Irritants):** কুয়াশা, ঠান্ডা বাতাস, ধূমপান (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ), এরোসোল স্প্রে, কাঠের ধোঁয়া, গ্যাসের ধোঁয়া, অন্যান্য ধোঁয়া, সুগন্ধি, কসমেটিকস, মসলার রান্না ইত্যাদি।
- **ভাইরাস জনিত কারণ:** রাইনোভাইরাস, আরএসভি, এডেনোভাইরাস ইত্যাদি। (URTI Bronchiolitis) আপার আর.টি.আই, ব্রঙ্কিওলাইটিস, সাধারণ ঠান্ডা এক বছর বয়সের শিশুদের থাকলে ভবিষ্যতে তা এজমা রোগ সৃষ্টি করতে পারে।
- **ঔষধ জনিত কারণ:** এসপিরিন, ব্যথানাশক ঔষধ (NSAID) বিটা ব্লকারস (প্রোপ্রানোলল, এটিনোলল, এমনকি চোখের ড্রপস)
- **অন্যান্য কারণ:**

- ঋতু, আবহাওয়া ও তাপমাত্রার পরিবর্তন।
- ব্যায়াম- অতিরিক্ত ব্যায়াম।
- আবেগ ও মানসিক চাপ, হাসি, কান্না, দুশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি।
- সার্জারী, গর্ভাবস্থা ও শ্বাসকষ্ট আক্রমনের ভয়।
- শিল্পোন্নত দেশ বা শহর, আবহাওয়ার পরিবর্তন।
- ১ থেকে ২ বৎসর বয়সী শিশুদের শ্বাসকষ্টের রোগ থাকলে পরবর্তীতে তাদের এজমা রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মা, বিশেষ করে গর্ভবতী মা ধূম পান করলে সন্তানের এজমা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাত বৎসরে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া শিশুদের এজমা হওয়ার সম্ভাবনা ৮০%।

পরামর্শঃ

এজমা/শ্বাসকষ্ট হলে নিকটস্থ এজমা বিশেষজ্ঞ বা হাসপাতালে যেতে হবে এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে এলার্জী হলে তার চিকিৎসা নিতে হবে এবং এলার্জী জাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে।

কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

এজমা প্রতিরোধে করণীয় এবং বর্জনীয়

করণীয়	বর্জনীয়
১। বাড়ীতে/ঘরে মুক্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।	১। ঘরে কার্পেট ব্যবহার ও অতিরিক্ত আসবাব পত্র কমাতে হবে। বালিশ ও কম্বলে পাখির পালক ব্যবহার করা যাবে না।
২। দুই বৎসর পর্যন্ত শিশুকে মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে।	২। ভাইরাস সংক্রমনের জন্য এন্টিবায়েটিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। ব্যথানাশক ঔষধ ব্যবহার কমাতে হবে।
৩। খাবারে কম লবণ খেতে হবে।	৩। বাহিরের ধূলাবালি, পরাগরেনু, ঠান্ডা বাতাস, ধোঁয়া, দূষিত বাতাস পরিহার করতে হবে।
৪। খাবারে বেশি মাছ, কম মাংস থাকতে হবে। আপেল, কলা, আদা, মিষ্টি আলু, হলুদ, সূর্যমুখী তৈল, পালং শাক খাওয়া উপকারী।	৪। ধুমপান পরিহার করতে হবে। ধূমপায়ীদের নিকট থেকে দূরে থাকতে হবে। লাল মাংস, মসলাযুক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড পরিহার করতে হবে।
৫। গ্রীষ্মকালে বাহিরে খেলাধুলা, শীতকালে ঘরের ভিতরে খেলাধুলা করতে হবে। সাঁতার এজমা রোগীদের সবচেয়ে বেশী উপযোগী ব্যায়াম।	৫। টেলিভিশন বা কম্পিউটার এর সামনে ৩ ঘন্টা বা তার বেশি সময় কাটানো যাবে না।
৬। শ্বাসের ব্যায়াম নির্দেশমত করতে হবে।	৬। দুগ্ধ দানরত মা এলার্জীর খাবার বন্ধ করতে হবে।
৭। পেশার কারণে এজমা হলে পেশা বদল করতে হবে।	৭। গরুর দুধ, পোষা প্রাণি পরিহার করতে হবে।
৮। ওজন বেশী হলে ওজন কমাতে হবে।	৮। আবেগ ও মানসিক চাপ, দুশ্চিন্তা পরিহার করতে হবে।

অন্যান্য উপদেশঃ

- প্রতিরোধক ঔষধ নিয়মিত নিতে হবে।
- দৈনন্দিন জীবনে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।
- শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে (প্রয়োজন অনুযায়ী কাপড় চোপড় বদলিয়ে নিতে হবে)।
- শীতকালে ঘরের ভিতর গরম রাখতে হবে।
- গরমকালে-এসির অতিরিক্ত ঠান্ডা বাতাস পরিহার করতে হবে।
- ব্যায়াম করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ (Cromons) ব্যবহার করতে হবে।

সাতাঁর কাটা, হাঁটা, দলীয় খেলা (ভলিবল), যোগ ব্যায়াম, সাইকেল চালানো, জগিং করা বা দৌড়ানো হলো সর্বোৎকৃষ্ট ব্যায়ম।

- 0 -

কিডনী রোগ

কিডনী রোগ কি?

কিডনী রোগ অন্যান্য রোগের মত স্বাভাবিক রোগ। এই রোগ অনেক সময় জটিল আকার ধারণ করতে পারে। এই রোগ সাধারণঃ দুই ধরনের হয়ে থাকে।

১. সাময়িক কিডনী রোগ (AKI-Acute Kidney Injury)
২. স্থায়ী কিডনী রোগ (CKD-Chronic Kidney Disease)

কি কি কারণে এই সমস্যা হতে পারে?

১. সাময়িক কারণসমূহ

(১) ডায়রিয়া
(২) ইনফেকশন (সংক্রমণ)
- প্রস্রাবের ইনফেকশন (UTI)
- ফুসফুসের ইনফেকশন (Pneumonia)

(৩) ঔষুধ
- ব্যথার ঔষুধ (NSAID)
- অ্যান্টিবায়োটিক (প্রেসক্রিপশন ছাড়া)
- গর্ভকালীণন সময় রক্তপাত
- অপরিষ্কার বা অনিরাপদ গর্ভপাত করানো (Septic Abortion)

২. স্থায়ী কারণসমূহ

i) বহুমূত্র রোগ (ডায়াবেটিস)
ii) উচ্চ রক্তচাপ (হাইপার টেনশন)
iii) কিডনীর ছাঁকনীর প্রদাহ (গ্লোমেরুনেফ্রাইটিস)
iv) অন্যান্য (জন্মগত ও বংশগত ত্রুটির কারণে)

কিডনী রোগের সাধারণ লক্ষণসমূহ:

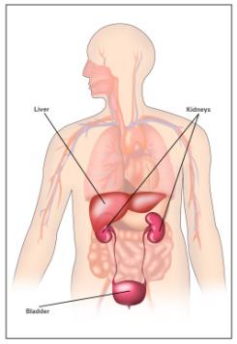

- ক্ষুধামন্দা
- বমি বমি ভাব
- বমি হওয়া
- দূর্বল লাগা
- শ্বাসকষ্ট হওয়া
- শরীরে পানি আসা (মুখমন্ডল, পায়ে)
- শরীরে চুলকানো
- প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া
- প্রস্রাবের রং পরিবর্তণ হওয়া (লালচে, ঘোলাটে)
- ঘুমের সমস্যা হওয়া
- অতিরিক্ত ঘুম

কিডনী রোগ প্রতিরোধের জন্য উপায়:

(ক) সাময়িক কিডনী রোগ প্রতিরোধের উপদেশ:

(১) ডায়রিয়া প্রতিরোধের জন্য
- ফুটানো পানি খাওয়া
- খোলা ও অপরিচ্ছন্ন খাবার না খাওয়া
- ডায়রিয়া হলে স্যালাইন খাওয়া
- ডাবের পানি, চিড়ার পানি খাওয়া।

(২) সংক্রমণ রোগ হলে (Infection), প্রস্রাবের জ্বালা পোড়া হলে, জ্বর হলে ও শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।
(৩) চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ব্যথার ঔষুধ অথবা এন্টিবায়োটিক না খাওয়া।
(৪) গর্ভকালীন রক্তক্ষরণ হলে গাইনী বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ও নিরাপদ প্রসব (Delivery) করানো।
(৫) নিরাপদ গর্ভপাত করানো (প্রয়োজন হলে)।

(খ) স্থায়ী কিডনী রোগ প্রতিরোধের উপদেশ:

- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা।
- শরীরে পানি আসলে, প্রস্রাব লাল বা ঘোলা হলে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া।
- ব্যাথার ঔষধ না খাওয়া।

- 0 -

স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

স্ট্রেস কি?

স্ট্রেস বা দুঃশ্চিন্তা প্রাথমিকভাবে বলা যায় একটি শারিরীক প্রতিক্রিয়া। আমরা যখন স্ট্রেসে থাকি তখন শরীরে কিছু হরমোন ও কেমিক্যাল বের হয়। যার ফলশ্রুতিতে হৃদকম্পন দ্রুত হতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যায়। রক্তচাপ বেড়ে যায়। রক্তে চিনির পরিমান বেড়ে যায়। রাগ, ক্রোধ, বিরক্তি, অন্যের প্রতি আক্রোশ বেড়ে যায়। স্ট্রেস বা দুঃশ্চিন্তা এড়ানো যায়না কিন্তু একে ম্যানেজ বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

স্ট্রেসের ক্ষতিকর দিক:

- ক্রমাগত দুশ্চিন্তার ফলে মানুষের ক্ষুধা এবং ঘুম নষ্ট হয়
- সামাজিক সম্পর্ক খারাপ হয়
- কাজের গতি কমে যায়
- এর ফলে গুরুতর মানসিক ও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে থাকে যেমন হতাশা, হজমে সমস্যা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, হার্টের সমস্যা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বেটিস এমন কি আত্মহত্যার প্রবণতা।
- দীর্ঘমেয়াদী স্ট্রেস বা অতিরিক্ত স্ট্রেসের ফলে স্মৃতিশক্তি লোপ পায়।

স্ট্রেস/দুঃশ্চিন্তা কমানোর উপায়:

লেখালেখি করুন, দৈনিক নির্দিষ্ট সময় বিশ্রাম খুব জরুরী, সেই সাথে রাতের ভাল ঘুমও। চাকুরীক্ষেত্রে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট খুবই প্রয়োজনীয় বিষয়। চাকুরীর পারফর্মেন্স ও সহকর্মীদের সাথে সুস্থ্য সম্পর্ক বজায় রাখতে সাহায্য করে। ব্যায়াম করলে শরীরে কিছু উপকারী হরমোন তৈরি হয় যেমন সেরোটোসিন যা বিষন্নতা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে । হাঁটা, ব্যায়াম করা, ব্রিফিং, ইয়োগা, ধ্যান ইত্যাদি শরীরে দুশ্চিন্তাকারী হরমোনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়িয়ে দেয়। আনন্দ পান, এমন কাজগুলো করুন যা পছন্দের বা সখের তা করবেন নিয়মিত তাতে মনের চাপ, স্ট্রেস অনেক কমে যাবে। স্ট্রেস থেকে মুক্ত থাকার ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ উপায় নিম্নে দেয়া হলো।

১। স্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেওয়া
২। রাতের ভাল ঘুম
৩। সকালের ব্যায়াম
৪। প্রচুর পানি খাওয়া
৫। পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ
৬। পজিটিভ চিন্তা করা
৭। সময়নিষ্ঠ হওয়া
৮। টেকনোলজির দাস হওয়া থেকে বিরত থাকা
৯। না বলতে শেখা
১০। কাজের চাপ কমানো

স্ট্রেস এর ফলে মানসিক ও শারীরিক ঝুকিগুলো কি কি?

- হৃদরোগ
- উচ্চরক্তচাপ
- ডায়াবেটিস
- আলসার
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হওয়া
- IBs (Irritable bowl syndrome)
- এলার্জি সমস্যা
- চুল পেকে যাওয়া ও পড়ে যাওয়া
- হাড় ও জয়েন্টে ব্যাথা
- স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া
- চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া
- বিষন্নতা, বিরুক্তি প্যানিক এটাক, নিজের উপর আস্থা কমে যাওয়া,
- আচরনের পরিবর্তন
- মাদকাসক্তি।

প্রতিকারঃ

- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে
- বাস্তবাদী হওয়া
- মনের কথা খুলে বলা
- নিয়মানুবর্তিতা পালন করা
- ব্যস্ত থাকার অভ্যাস করণ
- নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ থেকে কাজ করা
- জীবন ধারায় পরিবর্তন আনা
- না বলতে শিখুন
- পরিকল্পনা মাফিক কাজ করুন

পরিশেষে বলতে হবে যে পরিমিত টেনশনের চেয়ে অতিরিক্ত টেনশন হলে এবং সে কারণে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার প্রকাশ পেলে যথা সময়ে সুচিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়

ক্যানসার

লক্ষণ:

- ভাল হচ্ছে না এমন কোন ঘা থাকলে।
- স্তনে চাকা বা শক্ত অংশ অনুভূত হলে।
- তিল বা আঁচিল ধীরে ধীরে বড় হওয়া কিংবা রং পরিবর্তন হতে থাকলে।

- দীর্ঘস্থায়ী কাশি থাকলে অথবা কণ্ঠস্বর ভেঙে বা কর্কশ হয়ে গেলে।
- শরীরের কোন স্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণ হলে।
- পায়খানা বা প্রস্রাবের ধরন বা অভ্যাসের পরিবর্তন হলে।
- খাদ্য বা পানীয় গেলার সময় অসুবিধা বোধ করলে।

ক্যানসার প্রতিরোধে করণীয়:

- ধূমপান ও তামাকসেবন পরিহার করতে হবে।
- ক্যানসার সন্দেহ হলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে এবং পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে।

ডায়রিয়া

সংজ্ঞা ঃ পানি মিশ্রিত পায়খানা দিনে ৩ বার বা ততোধিন হইলে তাকে ডায়রিয়া বলে।

ডায়রিয়ার লক্ষণ ঃ

- পাতলা পায়খানা হওয়া
- বমি হওয়া
- বমি বমি ভাব
- পেট ব্যাথা
- পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া
- ওজন কমা
- জ্বর হওয়া

ডায়রিয়ার কারন ঃ সাধারণ ডায়রিয়া এক প্রকার ভাইরাসের সংক্রমনের কারণে হয়ে থাকে। এছাড়াও অন্যান্য কারণে ডায়রিয়া হতে পারে। কারণগুলো নিম্নরুপ ঃ-

- মদ্যপান.
- কোন খাবারের প্রতি সংবেদনশীলতা
- খাদ্যনালীর বিভিন্ন রোগ
- ব্যাকটেরিয়া সংক্রমন
- যে কোন ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া
- রেডিয়েশন থেরাপী

কখন চিকিৎসকের সরনাপন্ন হতে হবে।

- রক্ত আমাশয় বা কালো পায়খানা হলে
- ২৪ ঘন্টার বেশি সময় ধরে ১০১ ডিগ্রী F তাপমাত্রা থাকলে
- ২ দিনের বিশি সময় ধরে ডায়রিয়া থাকলে
- পানি শূণ্যতার লক্ষণ, গাঢ় প্রস্রাব, দ্রুত হৃদ স্পন্দন, পিপাসা, মাথা ব্যথা, চামড়া কুচকে যাওয়া, অসংলগ্ন আচরণ

চিকিৎসা: ডায়রিয়া চিকিৎসার প্রথম উদ্দেশ্য হলো পানি শূণ্যতা প্রতিরোধ করা।

- প্রতিদিন যে পরিমান পানি পান করি তাসহ প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর ২০০ মিঃ লিঃ খাবার স্যালাইন বা রাইচ স্যালাইন খেতে হবে।
- স্বাভাবিক খাবার খাবেন, তবে ঝাল ও তৈল জাতীয় খাবার পরিত্যাগ করে নরম হালকা খাবার গ্রহণ করুন।
- মল পরীক্ষা করে সেই ফলাফল অনুযায়ী প্রতিষেধক ঔষধ গ্রহণ করা উচিত। মনে রাখতে হবে সাধারনত ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসায় কোন এন্টিবায়টিক প্রয়োজন হয় না।

- 0 -

রেস্পিরেটরী ট্র্যাক্ট ইনফেকশন (আরটিআই)

আর টি আই (Respiratory Tract Infection) হল শ্বাসতন্ত্রের শ্বাসনালীতে সংক্রমন (Infection)। এর কারণে ৩য় বিশ্বে প্রতি বছরে প্রায় ৪৫ লক্ষ শিশু মারা যায়। তৃতীয় বিশ্বের শিশুরা উন্নত দেশগুলোর চেয়ে ৭ গুণ উর্ধ্বশ্বাসনালীর সংক্রমনে মারাত্নকভাবে আক্রান্ত হয়। উক্ত রোগে ৩য় বিশ্বের শিশুরা সব শারীরিক প্রতিবন্ধিতার ১৩% প্রতিবন্ধি হয় (RTI accounts for 13% of all disabilities)।

আরটিআই এর প্রকারভেদ:

আর টি আই দুই প্রকার যথা-

১। উর্ধ্বশ্বাসনালী সংক্রমন (Upper RTI) (ল্যারিংস এর উপরে)

২। নিম্নশ্বাসনালী সংক্রমন (Lower RTI) (ল্যারিংস এর নিচে)

উদাহরণ ঃ

১। উর্ধ্বশ্বাসনালী সংক্রমন (URTI):

সর্দিজ্বর (Common Cold), গলাব্যথা (Pharyngitis), মধ্যকর্ণের সংক্রমন (Otitis Media), টনসিলের সংক্রমন (Tonsilitis) এবং উর্ধ্বশ্বাসনালী প্রদাহ (Croup-Epiglotitis)।

২।নিম্নশ্বাসনালীর সংক্রমন (LRTI): নিউমোনিয়া (Pneumonia), ব্রঙ্কিওলাইটিস (Bronchiolitis), হাঁপানি (Asthma), ব্রঙ্কিয়েকটেসিস (Bronchiectasis)।

আরটিআই এর কারণ:

রোগজীবানুঃ

(১) ব্যাক্টেরিয়া

গ্রাম পজিটিভঃ (৬১%) নিউমোকক্কাস, স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস, স্ট্রেপটোকক্কাস পায়োজেনস।

গ্রাম নেগেটিভঃ ই.কলাই, সালমোনেলা স্পেসিস।

(৩) **ভাইরাসঃ** আর এস ভি (RSV), এডেনোভাইরাস, প্যারাইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস, রাইনোভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস ইত্যাদি।

(৪) **অন্যান্যঃ** যক্ষার জীবাণু (Mycobacterium Tuberculosis), ক্ল্যামাইডিয়া ট্রাকোমেটিস, নিউমোসিসটিস ক্যারিনি, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনি ইত্যাদি।

রিস্ক ফ্যাক্টর (Predisposing Factors):

ঘনবসতি, বড় পরিবার, অপুষ্টি (বিশেষ করে ভিটামিন এ এর অভাব), কম ওজনের নবজাতক শিশু, পরিবেশ দূষণ, কম বয়স, পিতামাতার ধুমপান ইত্যাদি। মেডিকেল রোগঃ ডাউন সিনড্রোম (URTI)।

নিম্নশ্বাসনালীর সংক্রমন:

(LRTI) কাশি বা শ্বাসকষ্ট, জ্বর-নিউমোনিয়ার সাধারন লক্ষণ। ঘন ঘন শ্বাস নেয়া, বুকের খাঁচার নীচে ডেবে যাওয়া ইত্যাদিও হতে পারে। অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের নিউমোনিয়াতে জ্বর নাও থাকতে পারে। ছোট শিশুদের নিউমোনিয়াতে তাপমাত্রা স্বাভাবিক, কম বা বেশী থাকতে পারে। মারাত্নক নিউমোনিয়ায় শ্বাস- প্রশ্বাসের হার কমে যেতে পারে।

পরামর্শ:

অনির্দিষ্ট প্রতিরোধ:

স্বাস্থ্য শিক্ষা: গর্ভবতী মায়ের যত্ন নিতে হবে- যাতে নবজাতক শিশুর জন্ম সঠিক সময়ে হয় এবং ওজন ভাল হয়। শিশুকে ২ বৎসর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধ খাওয়াতে হবে, সঠিক পুষ্টি দিতে হবে। নবজাতককে ঠান্ডা/শীত থেকে রক্ষা করতে হবে। পিতামাতার ধূমপান বন্ধ করতে হবে। ঘরের/বাড়ীর ভিতর বায়ুদূষণ কমাতে হবে। খাবারের আগে এবং নবজাতক শিশুকে ধরার আগে সাবান দিয়ে দুই হাত ধোয়ার (Hand washing) অভ্যাস করতে হবে যা আরটিআই এবং অন্যান্য রোগ অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে।

নির্দিষ্ট প্রতিরোধ: শিশুকে বিভিন্ন রোগের টীকা দিতে হবে। বিশেষ করে ডিফথেরিয়া, হুপিং কফ, হাম, যক্ষা, নিউমোনিয়ার টীকা আরটিআই থেকে শিশুমৃত্যু ৫০% কমিয়ে দিতে পারে। এছাড়া হিব (Hib), ইনফ্লুয়েঞ্জা টীকা প্রায় ৭০% রোগ প্রতিরোধ করে।

চিকিৎসা: আরটিআই এর মতো জরুরী রোগের চিকিৎসা জরুরীভাবে করতে হবে। যেমন- হাঁপানি, Croup, Epiglotitis, Pneumonia ইত্যাদি। অন্যান্য রোগের চিকিৎসা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী করতে হবে।

- ০ -

কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

সিওপিডি

লক্ষণ:

- শ্বাসকষ্ট, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।
- দীর্ঘদিন কফযুক্ত কাশি থাকে।
- শ্বাসকষ্টের কারণে প্রায়ই মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।

সিওপিডি প্রতিরোধে করণীয়:

- ধূমপান ও তামাক সেবন পরিহার করতে হবে।
- রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলোবাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- কারখানাতে কাজের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।

চর্মরোগ

প্রতিটি মানুষ সারাজীবন কোন না কোন চর্মরোগে আক্রান্ত হতে পারে। বেশির ভাগ চর্মরোগ তেমন গুরুতর না হলেও রোগটি সবার জন্য নানা অসুবিধা ও কষ্ট সৃষ্টি করতে পারে।

চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব হয় সাধারণত-

ক) গরমকালে
খ) ঘনবসতিপূর্ন পরিবেশে
গ) অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকলে

সাধারন কিছু চর্মরোগ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

১। ঘামাচি: গরমকালে এটি একটি সাধারন সমস্যা। সাধারনত ঘর্মগ্রন্থির মুখ বন্ধ হয়ে ত্বকের নিচে ঘাম আটকে যায় ফলে ত্বকের উপরিভাগে ফসুকুড়ি, লাল দানার মত দেখা যায় এবং চুলকায়। ত্বক শুকিয়ে নেয়া ও ঠান্ডা পরিবেশে থাকা এর চিকিৎসা।

২। ব্রন: সাধারনত বয়ঃসন্ধিকালে এ রোগটি বেশি দেখা যায়। ব্রন থেকে মুক্তি পেতে হলে তৈলাক্ত, ভাজা পোড়া খাবার পরিহার করা এবং শাকসবজি ও পানি প্রচুর পরিমানে খেতে হবে। ব্রনে ঘা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ সেবন ও ব্যবহার করতে হবে।

৩। স্ক্যাবিস/চুলকানি: এটা মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগ। এর স্থানীয় নাম খোস-পাঁচড়া। এটা একটি জীবানুবাহিত রোগ। এতে আক্রান্ত স্থানগুলিতে অসম্ভব চুলকানি হয় এবং রাতে চুলকানির তীব্রতা বাড়ে। আক্রান্ত স্থানে ছোট ছোট দানা বা গুটি দেখা দেয় । চুলকানির গুটিগুলোতে ঘা হতে পারে। সাধারণত ঘরে একাধিক ব্যাক্তি একসাথে আক্রান্ত হতে পারে। তাই সকলের একসাথে চিকিৎসা নিতে হয়। রোগীর ব্যবহৃত কাপড়, চাদর ও বালিশ চিকিৎসার সাথে সাথে পরিস্কার করতে হয়।

৪। একজিমা: এটি ত্বকের এক প্রকার প্রদাহ যেটি ছোঁয়াচে নয়। একজিমা বহু ধরনের হয়। তবে সাধারনত লালচে প্রদাহযুক্ত ত্বক, খসখসে ত্বক, চুলকানি, ছোট ছোট পানির ফুসকুড়ি ইত্যাদি হল একজিমার লক্ষণ। একজিমা শরীরের বিভিন্ন স্থানে হতে পারে। তবে হাত, পা, কনুই, বাহু, হাঠুর বিপরীত পৃষ্ঠা, গোড়ালী, হাতের কব্জি, ঘাড় ইত্যাদি অংশে বেশি হয়। একজিমার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। এর মুলতঃ কোন চিকিৎসা আবিষ্কৃত হয়নি তবে এর প্রকোপ কমানোর ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

৫। দাদ/ রিং ওয়ার্ম ইনফেকশন: শরীরের যে কোন স্থানে ফাংগাল ইনফেকশন হতে পারে। একে দাদ বলে। এটা ছোঁয়াচে রোগ। আক্রান্ত স্থান চাকার মত গোলাকার হয় এবং চুলকায়। মাথায় হলে চুল পড়ে যায়। আক্রান্ত স্থান পরিস্কার করে শুকনো রাখতে হবে। চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক এন্টিফাংগাল ঔষধ সেবন ও ব্যবহার করতে হবে।

৬। সোরিয়াসিস: এটি ত্বকের একটি জটিল রোগ যাতে ত্বকের কোষস্তর প্রতিনিয়ত মারা যায় এবং নতুন করে তৈরি হয়। ত্বকের কোষ বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, ত্বক পুরু হয়ে যায়, লালচে দাগ পড়ে, চুলকায়। সরাসরি সুর্যালোক সোরিয়াসিসের জন্য ক্ষতিকারক। রোগের কারণ সাধারনত বংশগত। দ্রুত সনাক্তকরণ জরুরী এবং আজীবন চিকিৎসা নিতে হয়।

৭। হাম ও চিকেন পক্স: এগুলো সাধারনত ভাইরাস জনিত রোগ এবং খুবই ছোঁয়াচে। এসময় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শ পরিহার করতে হবে এবং আক্রান্ত ব্যাক্তি বিশ্রামে থাকবে, পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করবে ও চিকিৎসকের স্বরণাপন্ন হবে।

৮। আর্সোনিকের কারনে চর্মরোগ: আর্সোনিক যুক্ত পানি খেলে ত্বকে ছোট ছোট কালো দাগ হতে পারে অথবা পুরো চামড়া কালো হয়ে যেতে পারে। ত্বক খসখসে হয়ে যায়। নখ পুরু ও শক্ত হয়ে যায়। হাত পায়ের তালুর চামড়ায় শক্ত গুটি দেখা যেতে পারে। এর শেষ পরিনতি হতে পারে কিডনী ও লিভারের কার্যক্ষমতা হ্রাস, ফুসফুস ও মুত্রথলির ক্যান্সার ইত্যাদি। তাই আর্সোনিক মুক্ত পানি পান অপরিহার্য।

চর্মরোগ আরও বহুবিধ হতে পারে, তবে সুষম খাদ্যাভ্যাস, প্রচুর পানি পান, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত ব্যায়াম অনেক চর্মরোগ থেকেই রেহাই দিতে পারে এবং ত্বককে করতে পারে স্বাস্থোজ্জল।

- ০ -

ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

১। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ঔষধ গ্রহণ করবেন না।
২। ঔষধের যেমন উপকারিতা আছে তেমনি ক্ষতিকারক দিকও আছে। ডোজের অতিরিক্ত বা কম উভয়েই শরীরের জন্য ক্ষতিকারক।
৩।কথায় কথায় এন্টিবায়োটিক গ্রহণ করবেন না। ইহাতে ঔষধের কার্যক্ষমাতা লোপ পায় ও শরীরে এন্টিবায়োটিকের রেজিস্ট্যান্স (Resistance) তৈরী হয়।
৪। ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যেমন- বমি, এসিটিডি, মাথা ঘুরানো, দুর্বলতা, ড্রাগ এলার্জী, রক্ত শূন্যতা, অন্ধত্ব, যৌন ক্ষমতা হ্রাস এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।
৫। অতিমাত্রায় এন্টাসিড জাতীয় ঔষধ সেবনে শরীরের হাড়সমূহ দূর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।
৬। গ্যাস্ট্রিকের ঔষধ যেমন-ওমেপ্রাজল বেশী দিন সেবন করলে রক্ত শূন্যতা দেখা দিতে পারে। রেনিটিডিন বেশী দিন সেবন করলে যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়।
৭।একাধিক ঔষধ সেবনের ক্ষেত্রে ঔষধ সমূহের মধ্যকার মিশ্রবিক্রিয়ার কারনে ঔষধের কার্যকারিতা লোপ পেতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্ব প্রতিক্রয়া:

অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবীর আক্রমণে সৃষ্ট সংক্রমন নিরাময়ে কাজ করে। এটি জীবন রক্ষাকারী ঔষধ হলেও এর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যা নিম্নরুপ:

১। এমোক্সিসিলিন এবং মেট্রোনিডাজল এর মত অ্যান্টিবায়োটিকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার ফলে মারাত্নক ধরণের ডায়রিয়া হতে পারে। এধরণের ডায়রিয়ার ক্ষেত্রে দুর্গন্ধযুক্ত ও পানির মত মল হয়।
২। কিছু অ্যান্টিবায়োটিক সেবনের ফলে এসিডিটি ও গ্যাসের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।
৩। সালপা টেট্রাসাইক্লিন এর মত ঔষধগুলো ত্বকের এলার্জি সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরণের এলার্জির ক্ষেত্রে চুলকায় এবং ত্বকে দাগ পড়ে। বিরল ক্ষেত্রে এই ধরনের এলার্জি স্টিভেন্স-জনসন সিনড্রোম তৈরী করতে পারে যা একধরণের মারাত্নক চর্মরোগ।

কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

৪। অ্যান্টিবায়োটিকের একটি সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভ্যাজাইনাল ইস্ট ইনফেকশন হওয়া। টেট্রাসাইক্লিন এবং ক্লিন্ডমাইসিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক ইস্টের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে।
৫। অ্যান্টিবায়োটিক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুখের ইনফেকশন বা স্টোমাটাইটিস সৃষ্টি করে। এর ফলে মুখের কোণায় ঘা হয়।
৬। এমাইনোগ্লাইকোসাইডস এর মত ঔষধ কিডনির জন্য নিরাপদ নয় এবং কিডনিকে অকার্যকর করে দিতে পারে। আপনি যদি ইতোমধ্যে কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত হন তাহলে এধরণের ঔষধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

জেনে রাখা ভালো:

১। অনেক কাশির সিরাপেই কোডন ব্যবহার করা হয়। কোডিন আফিম জাতীয় ঔষধ হওয়ায় রোগী আস্তে আস্তে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, নেশা ধরায়। এছাড়াও কোডিনের অন্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো-পায়খানা শক্ত হওয়া, ঝিমুনিভাব, শ্বাসযন্ত্রের কাজকে প্রতিহত করা ইত্যাদি।
২। ঔষধে উপস্থিত নসক্যাপেন উপদানটির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো মাথা ব্যথা, বমিভাব বা বমি।
৩। বাচ্চাদের অধিকাংশ কাশির সিরাপেই থাকে প্রোমেথাজিন। এগুলিরও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অনেক। মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ঝিমুনি, দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়া প্রভৃতি।
৪। অ্যাসপিরিনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেমন- বমিভাব, বমি, পেটব্যথা, মাথাব্যথা, কান ভোঁ ভোঁ করা, ঝিমুনিভাব, পাকস্থলিতে রক্তক্ষরণ, পেপটিক আলসার ইত্যাদি। এলার্জি, পেপটিক আলসার, লিভারের রোগ, রক্তক্ষরণের রোগ থাকলে এবং গর্ভবতীদের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শ্বাসযন্ত্রের রোগ থাকলে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ১২ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার একবারেই নিষিদ্ধ।
৫। কারো গ্রাসট্রিক বা ডুওডেনাল আলসার থাকলে, হাঁপানি থাকলে গর্ভবস্থায় বা স্তনদানকারী মায়েদের ক্ষেত্রে বা এলার্জির ইতিহাস থাকলে এর ব্যবহার একবারেই নিষিদ্ধ। এছাড়া কখনো কালো পায়খানা, রক্তবমি হয়ে থাকলে, হার্টের, কিডনির রোগ হয়ে থাকলে কিংবা বয়স্কদের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার উচিত নয়। পেটের ব্যথা, বমি, ডায়েরিয়া, দুর্বলতা, অনিদ্রা, চুলকানি, গায়ে জল জমা, অ্যাসিডিটি এই ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া।

ঔষধ সেবন নির্দেশিকা

খাবার আগেঃ

- খাবার ত্রিশ মিনিট আগে ঔষধ নিন
- দুই মিনিট আগে নয়
- কারণ খাবার এর সাথে মিশে কিছু ঔষধের গুনাগুণ নষ্ট হয়ে যায়।

খাবার পরেঃ

- খাওয়ার ৫ থেকে ১০ মিনিট পরে আপনার ঔষধ নিন।
- কারণ কিছু ঐষধ আপনার পাকস্থলীতে জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে এবং তা খাবার এর উপস্থিতিতে কার্যকর হয়।

কোর্স পূর্ণ করুনঃ

- শরীরের ভেতরের জীবাণু নষ্ট করতে ঔষধ শেষ করুন যদিও সুস্থ্য বোধ করেন। অন্যথায় রয়ে যাওয়া জীবাণু শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং ঔষধ এর কার্যকারিতা নষ্ট করে আপনাকে আরও অসুস্থ করতে পারে।

- o -

লিভার ডিজিজ

লিভার একটি মেটাবলিক অরগ্যান। ইহা জারক রসের সাহায্যে পরিপাকের বা হজমের কাজ করে। পিত্তথলি ইহার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। লিভারে অনেক রকম রোগ হয় যেমন-

(১) লিভার প্রদাহ
(২) জন্ডিস (উপসর্গ)
(৩) লিভার এ্যাবসেস বা ফোঁড়া
(৪) লিভার সিরোসিস
(৫) লিভার এ্যানকেপালোপ্যাথী
(৬) লিভার ফেইলার
(৭) ফ্যাটি লিভার
(৮) লিভার টিউমার ও ক্যান্সার
(৯) পিত্ত থলিতে ক্যান্সার

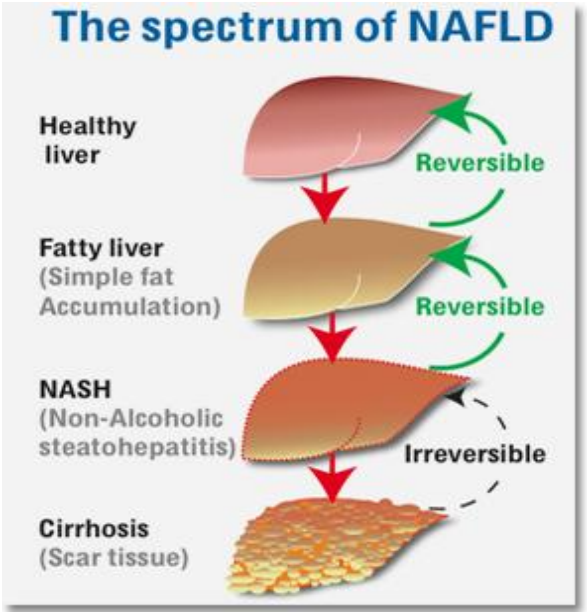

লিভার ডিজিজের লক্ষণ:

- ক্ষুধা মন্দা হওয়া বা অরুচি হওয়া
- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া
- চোখ ও ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া
- পেট ব্যাথা ও ফুলে যাওয়া
- প্রশ্রাবের রং হলুদ বর্ণের হওয়া
- পায়খানার রং রক্ত বর্ণের/সাদা অথবা কাদামাটির মতো হওয়া
- অবসাদ গ্রস্থ বা দূর্বল লাগা
- ওজন কমে যাওয়া
- পা ও হাঁটু ফুলে যাওয়া

লিভার ডিজিজের কারণ:

১। ইনফেকশন, যেমন- (ক) হেপাটাইটিস-এ, (খ) হেপাটাইটিস-বি, এবং (গ) হেপাটাইটিস-সি ভাইরাসের মাধ্যমে ইনফেকশন হতে পারে
২। দুষিত খাবার বা পানি খাওয়া
৩। হাত না ধূয়ে খাওয়া
৪। ব্যবহৃত সূঁচ / নিডল ব্যবহার করা
৫। জীবানুযুক্ত রক্ত সঞ্চালন করা
৬। এ্যালকোহল বা মদ পান করা

কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা

৭। ডায়াবেটি নিয়ন্ত্রণে না থাকা
৮। ওজন বেড়ে যাওয়া
৯। রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া

প্রতিকার:

- বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি পান করা;
- হাত ধুয়ে খাওয়া;
- ইচ্ছামত ঔষধ সেবন না করা;
- কবিরাজি ঔষধ না খাওয়া
- ভ্যাক্সিন নেয়া;
- নতুন সিরিঞ্জ ও সূচ ব্যবহার করা
- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন করা
- এ্যালকোহল বা মদ পান না করা
- ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা
- লিপিড প্রোফাইল নিয়ন্ত্রণে রাখা
- উচ্চতা অনুসারে ওজন ঠিক রাখা
- লক্ষণ দেখা গেলে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া।

সিওপিডি

সিওপিডি কি?

ক্রনিক অব্সট্রাকটিভ পালমোনারী ডিজিজ সংক্ষেপে সিওপিডি। দীর্ঘদিন শ্বাস প্রশ্বাস জনিত রোগের কারণে সিওপিডি তৈরি হয়। এতে ফুসফুসের কোষগুলি শরু হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধার সৃষ্টি করে।

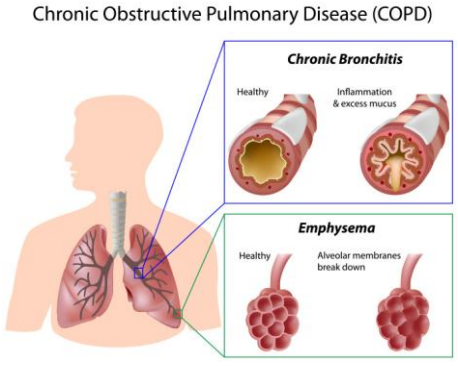

লক্ষণ:

- শ্বাসকষ্ট, যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।
- দীর্ঘদিন কফযুক্ত কাশি থাকে।
- শ্বাসকষ্টের কারণে প্রায়ই মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়।
- ঠিক মত শুয়ে থাকা যায় না।

প্রতিরোধের উপায়:

- ধূমপান ও তামাক সেবন পরিহার করতে হবে।
- রান্নাঘরে পর্যাপ্ত আলোবাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- কারখানাতে কাজের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে।
- নিয়মিত ঔষধ সেবন করতে হবে।
- ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- সমস্যা হলে হাসপাতালে যেতে হবে।

-o-